ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান

মুনতাসির মামুন

একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন, বাংলাদেশে বসবাসকারী অনেকে দেখেছে বহুদিন। অতীতে অনেকে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন যদিও তারা বাঙালি ছিলেন না। এ শতকের গত চল্লিশ বছরেও অনেকে সে ভূখন্ডের কথা বলেছেন, ভারত ভাগ হওয়ার সময় সে পরিকল্পনাও একবার হয়েছিল।

ষাটের দশকে মওলানা ভাসানীও বাঙালিদের জন্য স্বাধীন ভূখন্ডের কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সেই স্বপ্নের রূপ কেউ দিতে পারেনি। সেই স্বপ্ন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাস্তবে রূপ পেয়েছিল একেবারে একজন খাঁটি বাঙাল শেষ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তিনিই পেরেছিলেন বাঙালিদের জন্য নির্মাণ করে দিতে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সীমানা। বঙ্গবন্ধু বলি, জাতির জনক বলি, বা শেখ মুজিব বলি- যে নামেই সম্বোধন করি না কেন, বাংলাদেশের কথা বললেই ভেসে ওঠে তাঁর অবয়ব এবং সে কারণেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিহাসে এবং সে কারণেই আমরা তাঁকে স্মরণ করি বারবার।

বাংলাদেশের স্বপ্নের দাবিদার অনেকে। স্বপ্ন অনেকে দেখে থাকতে পারেন, অনেকে আকারে -ইঙ্গিতে বাংলাদেশের কথাও বলেছেন; কিন্তু শেখ মুজিব স্থপতি হিসেবে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আরো অনেকের মতো, তিনিও ভেবেছেন বাংলাদেশের কথা, কিন্তু ১৯৭১ পর্যন্ত গেছে প্রস্তুতিপর্ব। মাওলানা ভাসানীও প্রকাশ্য বক্তৃতায় বাংলাদেশের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর ভূমিকা সেক্ষেত্রে খুবই কম। তবে এসব স্বপ্ন, বক্তৃতা সবই মানুষকে প্রস্তুত করেছে।

যে কথাটি বলতে চাই, অথচ স্পষ্ট করতে পারছি না বোধ হয় তা হলো- শেখ মুজিব একেবারে গ্রামীণ ধান্য সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছিলেন সেই শ্যামলবরণ পুরুষ। প্রকৃতির উদারতার মতো ছিল তাঁর হৃদয়, তাই দিয়ে তিনি ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন বাঙালিকে। সমস্ত বাংলাদেশকে। বেঁচেছিলেন যতোদিন, বাঙালি তার প্রতিদানও দিয়েছিল ততোদিন।

একদিন, হঠাৎ ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে একজন মেজর বাঙালিদের বললেন, স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে এবং বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ল- এমন পদার্থ বাঙালি নয়। তাকে জাগাতে সময় লেগেছে বহুদিন এবং সেই কাজটি করতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং ভালো লাগুক না লাগুক তাঁকে স্বাধীনতার স্থপতি বলা ছাড়া উপায় কি? আর শেখ মুজিব কি ১৯৭০ সালে হঠাৎ 'বঙ্গবন্ধু' এবং ১৯৭২ সালে 'জাতির জনক' হয়ে গেলেন। তাও নয়। বঙ্গবন্ধু হতে সময় লেগেছে তাঁর তিন দশক। সেই চল্লিশ দশক থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়টুকু যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখব শেখ মুজিব, শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন কয়েকটি কারণে- তা হলো হৃদয়ের ব্যাপ্তি, মানবতা এবং সহিষ্ণুতা। তাঁর চলাফেরা, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা সবকিছুর মধ্যে ছিল সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখার ইচ্ছা। তাঁকে হত্যার আগে দেখি, শহরের মানুষরা ঘিরে আছে তাঁকে এমনভাবে যে, তিনি আর বেরুতে পারেননি তাদের ব্যূহ ভেদ করে। সে কারণেই কি অভিমানে নিশ্চুপ ছিল বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে?

পঞ্চাশের দশক থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক কারকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান অন্যতম। ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে তিনিই হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের রাজনীতির মূখ্য কারক। সেই সময় থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের ঘটনাবলী এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু-দশক পরও তিনি রয়ে গেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির সময়টি আমাদের অনেকের বেড়ে ওঠার সময়। এ সময় এত দ্রুত এত ঘটনা ঘটেছে যে তার অনেক কিছুই আজ আমাদের মনে নেই। যার ফলে, বর্তমানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অনেকে ঘটনার নতুন বিন্যাস, বিকৃতায়ন এবং যেহেতু আমরা অনেকেই বিস্মৃত সে সব ঘটনাবলী সম্পর্কে বা বর্ণিত হয়নি সেসব তেমনভাবে কোন গ্রন্থে, তাই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ইতিহাস। এখানে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেব।

১৯৭৫ সালের খলনায়করা যে ক্ষমতা দখলের একটা পাঁয়তারা করেছিলেন অনেকেদিন ধরে তারও কিছুটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন খোন্দকার মোশতাক। আমাদের ইতিহাসের অন্যতম এই খলনায়কের ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের পরিচয় পাই মুক্তিযুদ্ধের আগ থেকে। ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা এসে ধানমন্ডীতে বঙ্গবন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন সাবধানে থাকতে। সেদিন একমাত্র খোন্দকার মোশতাককে সেখানে দেখা যায়নি। স্বাধীনতার পর তিনি ওয়াজেদ মিয়ার কাছে তদবির করেছিলেন এ বলে যে, তাঁকে যেন জ্যেষ্ঠতাসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়। আরো পরে, ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে একদিন ড. ওয়াজেদ মিয়া খোন্দকার মোশতাকের বাসায় গিয়ে দেখেন, রশীদ নামে এক মেজর তার সঙ্গে গোপন আলাপ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে জনাব হান্নান কর্তৃক প্রচারিত শেখ মুজিবের ভাষণটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। ড. ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন- 'বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর-এর ঐ বীর সদস্যটি

বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর-এর ঐ সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।'

বাঙালি জনসাধারণ একটি স্বতন্ত্র, বিকল্প স্বাধীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার বোধ যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বুকের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে লালন করতে থাকে।

ড. জাহাঙ্গীর আরো লিখেছেন যে, এই সব নির্দেশের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নীতিমালার নির্দেশ দেন।'

এটা কি সম্ভব, কল্পনাতেও যে একজন মেজরের একটি ঘোষণা পাঠেই একটি দেশ স্বাধীন হয়ে যায়? সেই মেজর জিয়া পরে জেনারেল হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের পুনর্বাসন করছেন- এসবই সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি যে, তিনি কখনই বলেননি, স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গেও ড. জাহাঙ্গীরের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই, খানিকটা দীর্ঘ হলেও-

'কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব কি আকস্মিক? বোধ হয় নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে একটি ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে একটি মুহূর্তের অনিবার্যতা। সৃষ্টি করেছে ঘটনাবলীর অপ্রতিরোধ্যতা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা থেকে তৈরি হয়েছে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ - প্রতিরোধ উদ্ভুত অনিবার্যতা তৈরি করেছে মুক্তিযুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কার্যক্রম।' এরপর একমাত্র নাবালক, উন্মাদ ও মূর্খেরই একথা সাজে যে, একটি ঘোষণাতেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে, শেখ সাহেব বার্তা প্রেরণ করেছিলেন কি করেননি বা মেজর জিয়া ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতা ঘোষণা' করেছিলেন কি করেননি, এগুলো নিয়ে বিতর্ক করাও এক ধরনের বালখিল্যতা। কারণ, ইতিহাস যখন লেখা হবে একশ' বা পঞ্চাশ বছর পর, তখন স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামই উল্লিখিত হবে, বাকিরা ফুটনোটে থাকলেও থাকতে পারেন। এ নিয়ে তর্ক সময়ের অপচয় মাত্র।

শেখ মুজিব কয়েকবার ফয়েজ আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন কিছু একটা বলার জন্য।

ফয়েজ আহমদ বললেন, 'মুজিব ভাই, কথা বলতে মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।' তক্ষুণি উত্তর আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।' তখান তিনি জানতেন না যে শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্যে নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের বাণী স্বরূপ।

১৯৭২ সালে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরলেন শেখ মুজিব। এখন তাঁর ভূমিকা আর আন্দোলনকারীর নয়। এখন তাঁর ভূমিকা যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সোনার বাংলার তা পূরণ করার। তাঁর সোনার বাংলা তখন একেবারে বিধ্বস্ত। আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবেই তিনি ক্ষমতা নিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন, চীনের মাও-সে-তুঙের মতো তিনি আর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার নেবেন না, কারণ তিনি তো তখন আর দলীয় নেতা নন, তিনি বাংলাদেশের। চৌ-এ লাইয়ের মতো তাজউদ্দিন দেশ চালাবেন এবং তাজউদ্দিনের সেই প্রশাসনিক স্থিরতা ছিল। কিন্তু তা হয়নি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই। হলে হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতো।

প্রশাসনিক ভার নেওয়ার পর যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হলো তার প্রতিটাই সমালোচিত হতে লাগল। কারণ আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী অনেক দল ছিল। তারা দল হিসেবেই আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেছে এবং বর্তেছে দলীয় প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবের ওপর।

শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের কারণ হিসেবে সমালোচকরা নানা বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে মাত্র আলোচনা করব।

বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং আওয়ামী লীগের অহংবোধ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে। সরকার অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য করেছিলেন অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রধারীকে। এটি এক বড় ধরনের সাফল্য। কিন্তু এটাও ঠিক অস্ত্র সবাই জমা দেয়নি, এমনকি আওয়ামী লীগেরও। ভারতীয় বাহিনীকে শেখ মুজিব স্বল্প সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠাতে পেরেছিলেন। এটিও বড় ধরনের সাফল্য কিন্তু ভারতীয় বাহিনী ফেরার সময় শোনা যায় নিয়ে গিয়েছিল অনেক ক্যাপিটাল গুডস যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সহায়তাকারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়। পরে ভারতও স্বাধীনতাবিরোধীরা এই সেন্টিমেন্টকে সফলভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে অবৈধ অস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৩৪ ,৬০০ পাকিস্তানী দালাল বা স্বাধীনতাবিরোধীদের মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এর জন্য পাকিস্তান ও তার মিত্র মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের যথেষ্ট চাপ ছিল। এখনই বাংলাদেশের পক্ষে বহিঃস্থ কোন চাপ রোধ করা সম্ভব হয় না আর সে সময়তো দেশটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত। এছাড়া তৎকালীন বামপন্থী রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানী, আলিম আল রাজী প্রমুখ, এমনকি বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল, বামপন্থীদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত হলিডে সবাই বিচারের বিরোধিতা করেছিলেন। মওলানা ভাসানী ১৯৭৩ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দালাল আইন বাতিল করার আলটিমেটামও দিয়েছিলেন।

তাছাড়া স্বাধীনতার ঠিক পর পর প্রশাসন যেখানে বিধ্বস্ত সেখানে এত লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করাও ছিল দুরূহ। এসবকেও উড়িয়ে দেয়া যায় অজুহাত হিসেবে। তারপরও সত্য থাকে। তাহলো শেখ মুজিব ঘাতক, ধর্ষণকারী, খুনী, লুণ্ঠনকারী রাজাকার বা আলবদরদের অব্যহতি দেননি।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এই ধরনের যে সমস্ত কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধ অপরাধী বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে যারা নারী ধর্ষণ করেছে যারা অগ্নিসংযোগ করেছে তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি। কিন্তু ক্ষমা সত্ত্বেও এরা বাংলাদেশে টিকে থাকতে পারত কি না সন্দেহ যদি না ১৯৭৫ সালের পর জেনারেলরা সম্মানের সঙ্গে এ কাজটি করতেন এবং সব করা হয়েছিল সামরিক আইন জারি করে।

স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের সিভিল সমাজের চরিত্র এতই জটিল হয়ে উঠল যে, খুনী ও রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী শাখার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও হয়ে উঠল কষ্টকর। সব ধরনের লুটেরা সমন্বয়ে বিকশিত হলো এক ধরনের লুটেরা সমন্বয়ে বিকশিত হলো এক ধরনের লুটেরা সংস্কৃতির যা হীনবল করে দিতে লাগল বাংলাদেশের সিভিল সমাজকে। ঐ সময় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, রাইফেলস, পুলিশবাহিনী ছিল অসংহত এবং একই সঙ্গে কালোবাজারী, চোরাকারবারী ও সন্ত্রাসী রাজনৈতিক গ্রুপের মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার রক্ষীবাহিনী নামে নতুন একটি সশস্ত্র সংস্থা গঠন করল ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে।

কিন্তু আসল বিষয়টি কি। ড. মিয়ার বই থেকে জানা যায়, 'মস্কো থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীকে একীভূত করার। কারণ এই দুই বাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব প্রায় একই ধরনের। কিন্তু ঐ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে এই দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয় পিলখানার চত্বরে। এদের সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ওদের গোলাগুলি বন্ধ করানোর জন্য বঙ্গবন্ধু স্বয়ং পিলখানায় যেতে বাধ্য হন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দু'টি বাহিনীকে আলাদা করে দেয়া হয়।

রক্ষীবাহিনীর উদ্ধত আচরণ, নিপীড়ন আড়াল করার কিছু নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, রক্ষীবাহিনী প্রচুর অবৈধ অস্ত্র ও কালোবাজারী পণ্য উদ্ধার করেছিল এবং কালোবাজারী ও মুজতদাররা রক্ষীবাহিনীর ভয়েও থাকত।

শেখ মুজিবুর রহমান বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান। আর কোন দেশ এরকম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি ঘোষনা করা হয়েছিল, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা খানিকটা র‍্যাডিক্যালও বলা যেতে পারে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ শাসনামলের সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রতিপক্ষ এই দুর্ভিক্ষকে এখনো আওয়ামী বিরোধী প্রচারণার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিল এ বলে যে আওয়ামী লীগ এলে দেশে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এ ধারণায় ভীত হয়ে মহিলারা আওয়ামী লীগে ভোট দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

মওদুদ আহমদ লিখেছেন, 'অনশনকে যদি দুর্ভিক্ষের একটি পর্যায় বলে মনে করা হয়, তাহলে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই সোনার বাংলার মাটিতেই অসংখ্য লোক অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছিল।'

প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দুর্ভিক্ষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল আমেরিকা। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ তার মোকাবিলা করতে পারেনি। কিন্তু সারা দেশে যখন হাহাকার তখন চরম ডান ও বামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। ডানপন্থী বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতপন্থীরা বলতে থাকে, পাকিস্তান ভাঙার কারণেই আজ এই অবস্থা। চীনপন্থীরা বলা শুরু করে, বাংলাদেশ সংশোধনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে আজ এই দুর্বিষহ অবস্থা। শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে লাভবান একমাত্র পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক দুর্ভিক্ষের একটি ছবি ছেপে সারা দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ছবিটি ছিল জালপরা বাসন্তী নামের এক দরিদ্র মহিলা আহার খুঁজছে। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে ছবিটি বানানো।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭,০০০। বেসরকারি হিসেবে এক লাখ। এই দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি- সর্বক্ষেত্রে প্রবল অভিঘাত হেনেছে। যে দল এবং যে দলের নেতা সুদীর্ঘ তিন দশক লড়াই করেছেন সিভিল সমাজের জন্য, এখন সিভিল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধেই চলে গেল। এটিই ছিল ট্র্যাজেডি। সিভিল সমাজের সেই ক্রোধ তখন বোঝা যাবে কবি রফিক আজাদের একটি কবিতায়- 'ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো।' সেই ক্রোধ, সেই বিরূপতা, সেই আশাভঙ্গের বেদনা এখনো সিভিল সমাজ থেকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি আওয়ামী লীগ। দুর্ভিক্ষ রোধ করা যেত যদি খাদ্য মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করত, বিশেষ করে রংপুরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, খাদ্য সচিব আবদুল মোমেন খানের ব্যর্থতা খানিকটা দুর্বোধ্য। এ দুর্বোধ্যতা বিশ্লেষণ করতে হলে আবারও সেই দেশী-বিদেশী

ষড়যন্ত্রের নকশার ইঙ্গিত করতে হয়। কারণ শেখ মুজিব হত্যার পর দেখি, আবদুল মোমেন খান জিয়াউর রহমানের খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। এখন কেউ যদি বলেন, আবদুল মোমেন খানের স্থবিরতা দুর্ভিক্ষ ডেকে আনতে সাহায্য করেছিল, পতন ঘটেছিল সরকারের এবং তারই পুরস্কার মন্ত্রিত্ব- সেই লজিক নাকচ করা কষ্টকর।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ১৯৭৪ সালের জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও চতুর্থ সংশোধনী। ১৯৭৪ সালের জরুরি অবস্থা ঘোষণার পটভূমিকায় হয়তো যৌক্তিতা ছিল। কিন্তু যৌক্তিকতা যাই থাকুক না এ ঘোষণা চরম আঘাত হেনেছিল সিভিল সমাজে। কারণ, তার মাত্র দু-বছর আগে সংবিধানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর। জরুরি অবস্থার অন্তিম লক্ষ্য ছিল একদলীয় শাসন যা আবার ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আঘাত। এই যে প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণ তার কোনোটিই সিভিল সমাজ মেনে নেয়নি। হয়েছিল ক্ষুব্ধ। শুধু তাই নয়, যে দলটি গত দু'দশক কিছু আদর্শের জন্য লড়াই করেছে, যে নেতার পেছনে ঐ সব লক্ষ্য অর্জনে সারা জাতি আত্মত্যাগ করেছে, দু'বছরের মধ্যে সে দল ও নেতার ঠিক বিপরীত অবস্থা গ্রহণ সিভিল সমাজকে দারুণভাবে বিস্মিত করেছিল। কারণ ধরনটি ছিল পাকিস্তান আমলের মতো। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

সংসদ চতুর্থ সংশোধনীর ওপর ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেন, 'আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই। যে নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষায় দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু করতে যাচ্ছিলেন। এ দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে ছিল ১৯৭৫ সালের ৭ জুন জাতীয় দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল-এর কাঠামো ঘোষণা করা। এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সৈনিক, আমলা, বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের নেয়া হয়। এরপর শুরু হয় বাকশালে যোগ দেয়ার হিড়িক। রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দীর্ঘ লাইন দিয়ে বুদ্ধিজীবী, আমলা, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক, সবাই শেখ মুজিব বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে বাকশালে যোগ দেয়ার আবেদন করতে থাকেন।

১৯ জুন বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দীর্ঘ এক ভাষণে বাকশালের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পটভূমিকা বর্ণনা করেন। আসলে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এ পথেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন দেশকে। সে বিশ্বাসে কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি তা হলো গত তিন দশক তিনি যার জন্য লড়াই করে এসেছেন এবং যার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বাকশালের কনসেপ্ট তার বিপরীত। এই বৈপরীত্য সিভিল সমাজে অভিঘাত হেনেছে এবং আবারও রাজনৈতিক কারকদের সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। শেখ মুজিবের দীর্ঘ বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে পরিষ্কার হবে আসলে কি বিশ্বাসে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন।

তিনি আরো বলেন, আমি ফেরেস্তা নই। শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে রাখতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে না আমি যেটা করেছি সেটাই ভালো, দ্যাট কানট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হইনি যে সবকিছু ভালো হবে। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে। অলরাইট রেকটিফাই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।

ফাণ্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিকি অর্থনীতি করতে চাই। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।

এটা আমার মত, মাটির মত।

তবে, নতুন কর্মসূচি গ্রহণের পর পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। চালের দাম আট টাকা থেকে পাঁচ টাকায় নেমে আসে, আলু দুই টাকা পাঁচ পয়সা থেকে দেড় টাকায় নেমে আসে। ঢাকা শহরে মধ্যবিত্তের ব্যয়সূচক ৪৫৮.৫ জানুয়ারি থেকে ৪১৬.৯ এপ্রিল এবং খাদ্যসূচক একই সময়ে ৫৪৬.৩ থেকে ৪৫১.০ তে হ্রাস পায়। আগস্ট মাসে অবস্থার আরো উন্নতি হয় ভালো আবহাওয়া ও ফসল ভালেঅ হওয়ার কারণে। দ্রব্যমূল্য নামতে থাকে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, ষাটের দশকে শেখ মুজিব তরুণদের মন জয় করতে পেরেছেন। কারণ, তিনি তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই তরুণদের তিনি আর ৭২ সালের পর ধরে রাখতে পারেননি। কেন পারছেন না সেটি তলিয়ে দেখার সময়ও ছিল না। বর্তমান আওয়ামী লীগও তরুণদের তেমন আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে মনে হয়না। কারণ পূর্ব ইতিহাসের ওপর তাদের বেশি গুরুত্ব আরোপ। কি করেছি নয়, কি করব সেটিই এখন বিবেচ্য। তরুণদের স্বপ্ন দেখানো হয়তো তখনই সম্ভব যখন তাদের এবং বর্তমান সমস্যার সমাধান দেয়া হবে, নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রাখা হবে, দোদুল্যমানতা পরিহার করা হবে, সহিষ্ণুতার রাজনীতি বিকাশে সচেষ্ট থাকবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিএনপি তরুণদের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে। গত দেড় দশকে গণমাধ্যমে, পাঠ্যপুস্তকে মিথ্যাচারের মাঝে এবং পেশীশক্তির মাঝে তারা বড় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের বোধ নিয়ে আশা করা দুরাশা।

শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বুঝেছিলেন যা তার সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছিল প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান হতে পারে সংবিধান, নির্বাচন, ভোট, আমলাতন্ত্র, পার্লামেন্ট। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি এসবের কিছু সূচনা করেছিলেন যা সৃষ্টি করতে পারত সিভিল সমাজ আর বাংলাদেশতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সিভিল সমাজ গঠনের জন্যই। এই সিভিল সমাজ ভাঙার কাজটি শুরু করেছিলেন জে. জিয়া যাতে সমাজে অস্ত্রধারীদের প্রভাব থাকে, জে. এরশাদ সে কাজটি করেছিলেন সম্পন্ন এবং এখনো তা থেকে আমরা মুক্ত নই এবং সে কারণেই আবার ফিরে আসছেন আলোচনায় বারবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আওয়ামী লীগ শাসনের অভিঘাত এখনও লোকে ভুলতে পারেনি। তখন সদ্য স্বাধীন দেশ, মানুষ দেশের জন্য কিছু করতে প্রস্তুত। অধিকাংশ মানুষের তখন সোনার বাংলা গড়ার আকাঙ্ক্ষা। ফলে ছোট কোনো ঘটনা, কোনো ভুল, বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মানুষের মনে। রটনা হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু আওয়ামী লীগ তা মোকাবিলা করতে পারেনি।

শেখ মুজিবের হত্যার প্রায় দু'দশক পর মানুষ আবার অনুভব করেছে শেখ মুজিব কি ছিলেন। কেন তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি পেয়েছিলেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তিনি বাঙালিকে বড় করতে চেয়েছিলেন, আর মানুষকে বড় করার একটি পথ নিরস্ত্র মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া। তাঁর হত্যার পর কতদল ও কতজন শাসন করলো বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের মন থেকেতো তাঁকে মোছা গেল না, যে চেষ্টা এখনো অব্যাহত। কারণ, আজ আমরা দেখছি, আমরা একবারই সে মর্যাদা পেয়েছিলাম, সে পথ একবারই উন্মুক্ত হয়েছিল আমাদের জন্য ১৯৭১ সালে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান মানে একজন নিরস্ত্র বাঙালির নেতৃত্বে আমরা সব ধরনের সশস্ত্রদের হটিয়ে দিয়েছিলাম।

শেখ মুজিবের শত ত্রুটি, শত সমালোচনা সত্ত্বেও আমাদের বলতে হবে, যা লিখেছেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরোধী মওদুদ আহমদ- শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতার, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আজীবন তিনি বাঙালির স্বার্থে কাজ করেছেন এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপস করেননি, যে কারণে বাঙালি ভালবেসে তাঁর নাম দিয়েছে বঙ্গবন্ধু, আবেগে জাতির পিতা। আবহমান সাধারণ বাঙালির মতই ছিল তাঁর জীবনচর্যা, যে কারণে সব সময় তাঁর যোগ ছিল প্রবল সাধারণ মানুষ, সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যতই তিনি পরিবৃত হয়েছেন চাটুকার ও স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা, ততই এক সূত্র ছিন্ন হয়ে পড়ছিল এবং পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। সাধারণ বাঙালির সব বৈশিষ্ট্যই তিনি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু অসাধারণ ছিল তার মানুষ ও দেশের প্রতি ভালবাসা, যা ছিল অন্ধ। বলতেন তিনি, আমার শক্তি এই যে আমি মানুষকে ভালবাসি। আমার দুর্বলতা এই যে আমি তাদের খুব ভালবাসি। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক ও উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে রচনা অসম্ভব। এ শতাব্দীতে দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম জনমানসে ভাস্কর হয়ে থাকবে। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলাভাষাকে রূপ দিয়েছিলেন, যাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন এ জাতির জন্য স্বাধীন এক ভূখন্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। এ জন্য আমি গর্বিত, আমার উত্তরসূরিও হবে গর্বিত। বাঙালি ও বাংলাদেশ নামটিই বেঁচে থাকবে সে জন্য। আর এ কারণেই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন,

'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা রহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'